দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0·6 DEC-2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষার ৫ কোটি টাকার হিসাব পায়নি ঢাবি কর্তৃপক্ষ

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। বিগত বছরগুলোতে ভর্তি ফরম বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আয় করা হলেও এ টাকার ক্ষুদ্র অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়া হয়। আর বাকি টাকা কোন খাতে খরচ হচ্ছে তার হিসাব দাখিল করেন সংশ্লিষ্ট ডীন এবং ইনস্টিটিউট পরিচালকরা। এ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকার কোন হিসাব বুঝে পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারি অডিট শাখা। কয়েকবার এ টাকার হিসাব চাওয়া হলেও তার কোন হিসাব দাখিল করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ ইত্তেফাককে বলেন, ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন অনুষদের ডীন ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা দেখভালের দায়িত্বে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে কোন তদারকি করে না। গত তিন-চার বছর সংশ্লিষ্টরা ফরম বিক্রি থেকে অর্জিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিয়েছেন। তবে প্রতিবছর ভর্তি টাকার হিসাবের বিষয়ে সরকারি অডিট দলের আপত্তি থাকে বলে তিনি স্বীকার করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পর শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্যিকভাবে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম ২ টাকা মূল্যের ভর্তি ফরম বিক্রি হয়। এরপর ১৫ টাকা, ২০ টাকা, ২৫ টাকা, ৩০ টাকা, ৪০ টাকা, ৫০ টাকা, ৬০ টাকা, ১০০ টাকা, ১২৫ টাকা, ১৫০ টাকা, ২০০ টাকা, ২২৫ টাকা, ২৫০ টাকা থেকে সর্বশেষ ৩০০ টাকা নির্ধারণ হয় প্রতি ফরমের মূল্য। সাধারণ ভর্তি কমিটি ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ফরম বিক্রির অর্জিত টাকার শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভর্তি ফরম বিক্রির শতকরা ১০ ভাগ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়ার নীতিমালা চালুর এক বছর পর থেকেই তা লঙ্ঘন শুরু হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থের সংস্থানের জন্য ২৭ টাকার ফরমের বিপরীতে ১৯৯৭-৯৮ ও ৯৮-৯৯ সালে ফরমপ্রতি ৬০ টাকা জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে প্রতি ফরমের বিপরীতে ৬০ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা হারে দিয়ে নীতিমালা লঙ্ঘন করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি ফরমের মূল্য ২৫০ টাকা নির্ধারণের সঙ্গে ফরম বিক্রির শতকরা ৩০ ভাগ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কোটি কোটি টাকার বিপরীতে এ অর্থ শতকরা ৩০ ভাগ নয় বরং শতকরা ২, ৫ ও ৮ ভাগ জমা পড়েছে মাত্র। তবে গত তিন-চার বছর শতকরা কিছু টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। গত বছর বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি ফরম বিক্রির ১৫ ভাগ এবং অন্যান্য অনুষদে ২০ ভাগ জমা দেয়ার নিয়ম চালু করা হয়।

২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ইউনিটগুলোর বিগত বছরের পাওনা টাকার হিসাব এবং টাকা আদায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর ঐ বছর আগস্ট মাসে সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত হয় ২০০৫ সাল থেকে আর কোন ইউনিটের টাকা মওকুফ করা হবে না। কেন্দ্রীয় তহবিলে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ জমা দেয়ার হিসাব বাদ রাখলেও টাকা কোন খাতে খরচ করা হচ্ছে সে বিষয়ে কিছুই জানে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ অনুষদগুলোর কাছে পাওনা টাকা দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ফান্ডে জমা দেয়ার জন্য ডীন ও পরিচালকদের কাছে অনেক আগে চিঠি দিয়েছিলেন। তবে এখন পর্যন্ত পাওনা টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। ডীনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ভর্তি ফরমের টাকা অপব্যয় করা হয়। নিজ পছন্দের শিক্ষকদের দিয়ে ডীনরা অতিরিক্ত কাজ করিয়ে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে থাকে। ডিন ও পরিচালকরা একটি হিসাব তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখায় জমা দেয় মাত্র। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে নিয়ম মেনে টাকা জমা দেয়ার তেমন কোন পরিসংখ্যান নেই। এ খাত বাবদ প্রাপ্তির ঘর শূন্য। ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট-এর অধিকাংশই একবার টাকা দিয়েছে আবার কেউ পুরোটাই নিজের করে নিয়েছে। সর্বশেষ কবে ইনস্টিটিউটগুলো টাকা দিয়েছিল তার হিসেব দিতে পারেনি প্রশাসনিক ভবনের হিসাব শাখা। হিসাব শাখার এক কর্মকর্তা বলেন, ইনস্টিটিউটগুলো কোন টাকাই জমা দেয় না। এ জন্য কোন রেকর্ড আমাদের কাছে নেই।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক আশরাফ উদ্দিন বলেন, ডীনদের হিসেবের বিষয়ে সরকারি অডিট টিম প্রতিবারই আপত্তি করে। অডিট টিম ভর্তির টাকা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছে বলে তিনি জানান।

ভর্তির ফরমের টাকার বিষয়ে কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, এখন পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কিছুতেই খরচ বেড়েছে। সে হিসেবে আমাদের ভর্তি ফরম বিক্রি বৃদ্ধি পায়নি। তারপরও আমরা আমাদের সাধ্যমত কেন্দ্রীয় ফান্ডের টাকা পরিশোধ করার চেষ্টা করি। ফরম বিক্রির টাকা বিভাগের উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয় বলে তিনি জানান।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ বলেন, প্রতিবছরই নির্ধারিত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ফান্ডে জমা দেয়া হয়। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সকল টাকার হিসাব দাখিল করা হয়। এ টাকা নিয়ে কোনভাবেই অনিয়মের সুযোগ নেই।